বীতংস

সংসার-আশ্রয়ে থাকার আর কোনো অর্থ হয় না।

সুন্দরলালের মোহ কেটে গেছে অন্তত। আজ যে তোমার বন্ধু, সামান্য অর্থের জন্য কাল সে তোমার গলা টিপে ধরতে পারে, বড় আদরের যে সহোদর ভাইটিকে তুমি একদণ্ড চোখের আড়াল করতে পারো না, এক ছটাক জমির জন্য কাল হয়তো সে তোমার নামে এক নম্বর ফৌজদারী রুজু করে দেবে; যে রূপবতী স্ত্রীর পায়ে যথাসর্বস্ব পণ করে তুমি কাপড়ে গহনায় নৈবেদ্য সাজিয়ে দিচ্ছ, একদিন ভোরবেলা হয়তো দেখবে গায়ের ছোট্ট তেওয়ারীর সঙ্গে সে রাতারাতি হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেছে। সুতরাং মোহ-মুদ্গরের ভাষায় একদিন 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' বলে বেরিয়ে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এবং সুন্দরলাল বুদ্ধিমান লোক, তাই ত্রিশ বছর না পেরোতেই সংসার ছেড়ে শুরু হয়েছে তার অগস্ত্যযাত্রা! কোনো বন্ধনই আজ আর তাকে পিছু টানে না। মহিষচুরির ব্যাপার নিয়ে গায়ে জমিদারের সঙ্গে এখন আর মামলা করতে হয় না; ছোট্ট তেওয়ারীর সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য দিররাত চোখ কান খাড়া করে বসে থাকার দরকার নেই, পাথরের মতো নির্মম রাঙা মটিতে কঠিন পরিশ্রমে লাঙল ঠেলেও যদি ভালো গমের ফলন না করা যায়, তা হলেও এখন আর সম্বৎসরের ভাবনা ভাবতে হয় না।

এ জীবনের সঙ্গে তার কি তুলনা হয়? সামনে একখানা ছবির মতো নীল পাহাড়, তার সর্বাঙ্গে সাঁওতাল পরগনার অপূর্ব বনশ্রী! দুম্‌কা, যাওয়ার রাস্তাটা পাহাড়ের গা ঘেঁষে অনেক দূর দিয়ে বেরিয়ে গেছে, সেখান থেকে এতটুকুও পোড়া পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ এসে এখানকার আকাশ-বাতাসকে আবিল করে দেয় না। হর্নের বিকট শব্দে ভয়ত্রস্ত গরুর পাল এখানে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায় না; লাল রঙের বড় বাসখানা থেকে থেকে এক টুকরো পোড়া সিগারেট বা রেশমি শাড়ির একটা চলিত ঝলক মুহূর্তের মধ্যে যে একটা চাঞ্চল্যকর জগতের সংবাদ দিয়ে যায়, তার প্রভাব থেকেও ঐ জায়গাটা একেবারেই মুক্ত।

এখানে জঙ্গলের মধ্যে ডুম ডুম করে টিকারা বাজে। হাওয়ায় হাওয়ায় স্বপ্নের মতো শালের ফুল উড়ে যায়। যখন মহুয়াবন অকস্মাৎ আকুল হয়ে ওঠে, ছোট ছোট

গোলাপজলের মতো মহুয়ার সাদা ফুলগুলো তিক্তমধুর রসে টসটস করতে থাকে, আর তার গন্ধে হরিয়ালের দল এসে ডালে পাতায় নাচানাচি করে তখন সুন্দরলালেরও যেন নেশা ধরে যায়; সত্যিকারের আনন্দ তো এইখানেই। মোতিহারীর আদালতে যারা ফৌজদারী মামলার তদ্বির করে, কিংবা সীতামারীর চিনির কলে আখের দালালি করেই যারা দিন কাটিয়ে যাচ্ছে, তারা এর মর্ম কি বুঝবে?

তারা নাই বুঝল। কিন্তু সুন্দরলাল বুঝেছে। এখানকার সাঁওতালদের মনের ওপর রীতিমতো আসন গেড়ে বসেছে সে। তারা তাকে শ্রদ্ধা করে, হয়তো বিশ্বাসও করে আজকাল। সুন্দরলাল গেরুয়া নেয়নি বটে, তবু সে সন্ন্যাসী। দণ্ডী কিংবা ব্রহ্মচারী, এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য সাঁওতালেরা কখনো ব্যগ্র হয়ে ওঠে না। সুন্দরলাল হাত দেখতে জানে, যা বলে তা নাকি হুবহু মিলে যায় সব। শিকড়-বাড়ক সম্বন্ধে তার প্রচুর জ্ঞান, বহু কঠিন রোগে তার ওষুধ নাকি অব্যর্থক্রিয়া দেখিয়ে দিয়েছে।

সে শৈব, না রামায়েৎ, না গাণপ—এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু দেখা যায় তার কোনোটার ওপরেই বিদ্বেষ নেই। ব্যোম ভোলার নামে সে গাঁজার কলকেতে দম চড়িয়ে দেয়, সুর করে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ে। এখানে যারা 'বোঙার' পুজোয় মুরগি বলি দেয় বলি দেয়, তাদের পুজোর প্রসাদ দিতে তাকে কখনো আপত্তি করতে দেখা যায় না। সময় তো মোটে দু'মাস, কিন্তু এর মধ্যেই সাধু সুন্দরলাল মহাপুরুষ সুন্দরলালে রূপান্তরিত হওয়ার উপক্রম করছে।

আকাশ সন্ধ্যার রং। সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ের অরণ্যমণ্ডিত চূড়োয় চূড়োয় নিবিড় ছায়া সঞ্চারিত হতে লাগল। শালবন ঘেরা দূরের উপত্যকাটা থেকে যে ছোট পথটা ঘুরে ঘুরে ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাকে দেখে মনে হয় যেন মৃত একটা বিশাল অক্টোপাসের প্রসারিত নিশ্চল বাহু। যেন মৃত্যুর আগে একবার ঐ পাহাড়টাকে মুখের ভেতর টেনে আনার শেষ চেষ্টা করেছিল।...

পাহাড়ের গায়ে গায়ে ওই পথটা বেয়ে সুন্দরলালের ভুটানী খচ্চরটা নেমে এল। এটা ওর সন্ন্যাসের সঙ্গী,—নাগা সন্ন্যাসীর লোটা চিমটার মতোই অপরিহার্য। সন্ন্যাসী হলেও সুন্দরলাল একেবারে বাবা ভোলানাথের মতো ছাই মেখে নিরংকুশ হয়ে বেরিয়ে পড়েনি, অশন-বসনের দায়টা সে মানে। তাই ডেরা তুলতে হলে তার ছোট্ট গাঁটরিটাকে খচ্চরের পিঠেই বেঁধে দিতে হয়। তা ছাড়া কেন কে জানে অন্তত সপ্তাহে একবার তাকে শহর থেকে ঘুরে আসতে হয়, শিষ্য-সামন্তদের দর্শন দেবার জন্যই হয়তো। সে কারণেও খচ্চর খচ্চরটাকে বাদ দিয়ে চলবার জো নেই।

ছোট্ট ছোট্ট পায়ে খট্ খট্ করে হাঁটতে হাঁটতে খচ্চরটা একেবারে সাঁওতাল পাড়ার মাঝখানে এসেই থামল। মাগার পাগড়িটা খুলে একপাশে দিয়ে লাফিয়ে পড়ল সুন্দরলাল। কাঁচা চামড়ার তৈরি পুরনো নাগরা জুতোটার কাঁটা লোহাগুলোতে

একটা কর্কশ শব্দ বেজে উঠল, আর সেই শব্দটাকে ছাপিয়ে ময়লা চাপকানটার লম্বা পকেট ঝন ঝন করে সাড়া দিলে কয়েকটি ধাতু মুদ্রা।

বহু দূর থেকে আসতে হয়েছে। খচ্চরটারও পরিশ্রম হয়েছে খুব। ঘাড়ের ওপরকার ছোট ছোট খাড়া লোমগুলোর তলাটা ঘামে ভিজে গেছে, মুখের পাশে পাশে ফেনার আভাস। দড়ির লাগামটা ধরে তাকে ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল সুন্দরলাল।

কোথা থেকে এল বাবা ঠাকুর?

প্রশ্ন শুনে সুন্দরলাল মুখ তুলে তাকাল। সামনে ঝড়ু সাঁওতাল। গ্রামের লোকে মোড়ল বলেই মান্য করে তাকে। পরনে বস্ত্রের বেশি বাহুল্য নেই, শুধু ছোট একটি ফালি নেংটির মতো করেপরা। মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোকে ঘিরে আর একটুকরো কাপড়, তার একপাশে গোটা তিনেক পালক গোঁজা। হাতে বাঁশের ছিলা দেওয়া কুচকুচে কালো প্রকাণ্ড একটা ধুনক, আর সেই সঙ্গে গোটা কয়েক বাঁটুল।

—কে, মোড়ল? কী শিকার পেলি রে?

—কিছু নয় বাবাঠাকুর। মহুয়া বনে গিয়েছিলুম হরিয়াল মারতে, কিন্তু বরাত খারাপ। তুমি কোথা থেকে এলে?

—আমি? প্রশান্ত হাসিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল সুন্দরলালের মুখ। এ হাসিটাকে আধ্যাত্মিক মনে করলে দোষ হয় না। সাধনার পথে সে কতখানি এগিয়ে গেছে, এ হাসি দেখে তার কিছুটা অনুমান করা চলে।

—আমি?—আমি গিয়েছিলুম ওপারের ওই গাঁয়ে। ওখানেই একজনকে ভূতে ধরেছিল কিনা, এসে বড্ড কান্নাকাটি করছিল। তাই একবার ঝেড়ে দিয়ে আসতে হলো।

প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ঝড়ু একবার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করলে সুন্দরলালের। সত্যি কথা,—সন্ন্যাসের কোনো লক্ষণ নেই সুন্দরলালের শরীরে। চুলটি দিব্যি করে আঁচড়ানো, চাপকানের পকেট থেকে পিতলের ডিবে বের করে তা থেকে মস্ত একটা খিলিপান মুখ পুরে দিলে। জর্দার চমৎকার গন্ধটা দস্তুরমতো লোভনীয়। চলার সঙ্গে সঙ্গে পকেটের টাকাগুলো ঝন ঝন করে বেজে উঠেছে।

তবু সুন্দরলাল যে সাধু মোহান্ত, তাতে সন্দেহ করার হেতু কী!

মুগ্ধ বিস্ময়ে ঝড়ু বললেন, ভূত ছাড়ল?

—ছাড়বে না? চালাকি নাকি? একি যে সে মন্ত্র! হিমালয়ের চূড়োয় পাঁচশো বচ্ছর ধরে ধ্যান করেছেন নাঙ্গা বাবা। ইয়া লম্বা সাদা দাড়ি, লুটিয়ে পড়েছে একেপারে পা পর্যন্ত। আর সে কী চেহারা, দাঁড়ালে তালগাছের মাথায় গিয়ে ঠেকে। সে-বার আমি নেপালে পশুপতিনাথের মন্দিরে ধ্যান করছি বসে। মাঝ রাত্তির, ঘুট ঘুট করেছে অন্ধকার—হঠাৎ যেন পূর্ণিমার বাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তাকিয়ে দেখি ওই মূর্তি—পেছনে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে।

সূর্য অস্ত গেছে। পায়ের তলায় মড় মড় করছে শুকনো শালের পাতা। ঝড়ু মোড়লের সারা গা ছমছম করে উঠল।

—তারপরে?

তারপর আর কী?—সুন্দরলালের কণ্ঠে গর্বের আভাস লাগল। নাঙ্গা বাবা বললেন, যা ব্যাটা, তোর হয়ে গেছে। আজ থেকে সিদ্ধিলাভ করলি তুই। ভূত পিরেত-পিশাচ দানো তোর ছায়া দেখলেও ছুটে পালাতে পথ পাবে না।

দুপাশের বনজঙ্গলগুলো সন্ধ্যার সঙ্গে আরো ঘন করে ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে। সুন্দরলালের মুখ দেখা যায় না, তবু ঝড়ু একবার সে মুখখানাকে দেখবার চেষ্টা করলে। এমন একটা লোকের পাশে পাশে হেঁটে চলেছে, ভাবতেও সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

বনের পথটা পেরোতেই সামনে গ্রাম দেখা দিল। আকাশের এক কোণে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ এতক্ষণে কোথায় আত্মগোপন করেছিল সে জানে! জঙ্গলের আড়ালটা কেটে যেতেই কাঁকর-বিছানো পথটার ওপর তার আলো ঝিলমিল করে উঠল। সাঁওতাল পাড়ায় মাদলের শব্দ। মহুয়ার গন্ধের সঙ্গে ওই শব্দটার চমৎকার একটা ছন্দোগত ঐক্য আছে বোধহয়।

ঝড়ু সবিনয়ে বললে, একবার নাচ দেখতে যাবে না বাবাঠাকুর?

—নাচ? আচ্ছা চল।

দুদিকে মাটির দেয়ালে গাঁথা ছোট ছোট নিচু বাড়ি। মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় বসেছে নাচের আসর। কষ্টিপাথরের তৈরি কালো চেহারার দুজন পুরুষ দুলে দুলে মাদলে ঘা দিচ্ছে, আর সেই মাদলের তালে ঝুঁকে ঝুঁকে কয়েকটি মেয়ে নৃত্য করছে। পরস্পরের বাহুতে তারা আবদ্ধ, মুখে অস্ফুট গানের উচ্ছ্বাস। সে গানের ভাষা বোঝার জো নেই, কিন্তু তার ধ্বনিটা একটা বিচিত্র গুঞ্জনের মতো বাজছে।

সুন্দরলালকে আসতে দেখে মাদল আর নাচ দুই-ই থেমে গেল। মেয়েদের কালো চোখে দেখা দিল কৌতূকের উজ্জ্বল আভা, পুরুষদের কণ্ঠে উঠল ভক্তিমুগ্ধ কলরব। কেউ কেউ উঠে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন, কেউবা আবার কোথা থেকে কাঠের একটা চোপাই টেনে নিয়ে এল।

যথোচিত মর্যাদা আর গাম্ভীর্য নিয়ে চোপাইটাতে আসীন হলো সুন্দরলাল। পুরুষেরা ঘিরে বসল তার চারপাশে। নাকের রুপোর আংটির ভেতর আঙুল দিয়ে মেয়েরা তাকিয়ে রইল নির্বোধ দৃষ্টিতে।

সুন্দরলাল গম্ভীর হয়ে বললেন, নাচ থামালি কেন? চলুক না।

ঝড়ু মোড়লের কণ্ঠস্বর ব্যগ্র হয়ে উঠল : হাঁ হাঁ, নাচ চলুক। ভালো করে নাচ দেখিয়ে দে বাবাঠাকুরকে।

আবার মাদলে ঘা পড়ল। শালবনের ওপর দিয়ে চাঁদ তখন অনেকখানি উঠে

এসেছে। মেয়েদের উজ্জ্বল চোখগুলোতে, সুঠাম সম্পূর্ণ দেহশ্রীর ওপর দিয়ে জ্যোৎসা গড়িয়ে পড়তে লাগল তরল লাবণ্যের মতো। সংসারবিরক্ত সুন্দরলালের নিজের অজ্ঞাতেই খানিকটা সংসক্ত হয়ে উঠল হয়তো; হয়তোবা রক্তের এই চাঞ্চল্যটা পুরোপুরি দার্শনিকভাবেই অনুপ্রাণিত নয়।

দশ-বারোটি মেয়ে একসঙ্গে নাচছিল। তাদের ভেতর প্রায় প্রৌঢ়া থেকে নিতান্ত বালিকা পর্যন্ত সব স্তরের মেয়েই আছে। তবে যুবতীর সংখ্যাই বেশি। অথবা অল্পতেই এরা বুড়িয়ে যায় না বলেই হয়তো এদের যৌবন সব সময়ে বয়সের হাত ধরে চলে না। সুন্দরলালের সংসারাশ্রমের কথা মনে পড়ে। তার স্ত্রীর বয়স তো এখনো কুড়ি পার হয়নি, কিন্তু—

চমক ভাঙল। এক ভাঁড় মহুয়ার মদ এসে গেছে। ঝড়ু বলল, পেসাদ করে দাও বাবাঠাকুর।

সুন্দরলাল আপত্তি করলেন না। সন্ন্যাসের শেষ স্তরে উঠে সে নির্বেদ লাভ করেছে বলা চলে। মাটির পাত্রে করে উগ্রগন্ধী মহুয়ার মদে গলা ভিজিয়ে নিলেন সুন্দরলাল।

জ্যোৎস্নার জোয়ার এসেছে ততক্ষণে। বাতাসে শাল ফুলের গন্ধ। এ দেশের লোক ও গন্ধটাকে স্বাস্থ্যের অনুকূল মনে করে না, কিন্তু ওর সঙ্গে মহুয়ার তিক্ত মদিরতা মিশে গিয়ে আফিমের মতো একটা বিষাক্ত নেশায় যেন আচ্ছন্ন করছে চৈতন্যকে। কী কার্যকারণযোগে ওপাশের একটি তরুণী মেয়ের আন্দোলিত দেহ বল্লরীর ওপর গিয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়ল সুন্দরলালের দৃষ্টি। যেন মূর্ছিত হয়ে গেল বললেই ঠিক বলা হয়।

সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্যপুষ্ট সম্পূর্ণতা। এমন মেয়ে এই অবাধ স্বাস্থ্যসৌন্দর্যের দেশেও বিরল। সুন্দরলালের চোখ জ্বলতে লাগল।

—ওই মেয়েটা কে রে মোড়ল?

প্রশ্ন শুনে ঝড়ু সাঁওতাল কৃতার্থ হয়ে গেল যেন।

—ওই, ওর কথা বলছো? ও তো আমারি মেয়ে—বুধনী।

চাপকানের পকেটে হাত দিয়ে সুন্দরলাল টাকা পয়সাগুলোকে নাড়াচাড়া করতে লাগল। সে বৈরাগী, সে হিসেবে ধাতববস্তুর ওপরে তার যতটা অনাসক্তি থাকা উচিত তা নেই। সুন্দরলালের ভারী ভালো লাগে টাকা বাজানোর শব্দটা; ঠিক যেন গানের মতো কানে বাজে।

—বুধনী? বাঃ বেশ নাম তো। ডাক তো ওকে।

বুধনী এগিয়ে এল। কতকটা বিস্ময়, কিছুটা কৌতুক। ভয়ও যে একেবারে না আছে তা নয়। সুন্দরলাল হাত দেখতে পারে, ভূত ছাড়াতে পারে, আরো কত কী জানে ঠিক নেই। তার সামনে এসে দাঁড়াতে বুক যে খানিকটা দুর দুর করবে—এটা তো স্বাভাবিক।

কয়েক মুহূর্ত বুধনীর দিকে স্তব্ধ হয়ে রইল সুন্দরলালের দৃষ্টি। গায়ের কাপড়টা ভালো করে টেনে দিয়ে সংযত হওয়ার চেষ্টা করল বুধনী।

জামার পকেট থেকে দুটো টাকার বের করে আনল সুন্দরলাল : নে, তোদের মিঠাই খেতে দিলুম। আর—আর—

মুহূর্তে কোথা থেকে কী হয়ে গেল। হয়তো মহুয়ার প্রভাবেই বিচিত্র রকমে গাঢ় ও গভীর হয়ে উঠেছে তার কণ্ঠস্বর; তুই কেন এখানে পড়ে আছিস বুধনী? তোর যে ভারী জোর বরাত। নাঙ্গা বাবার কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে শহরে গিয়ে যে তোর কাপল ফিরে যাবে এ তো আমি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

সুন্দরলাল যেন দৈববাণী করছে। এ যেন সে নয়—যেন তার সত্তার ভেতর থেকে একজন কে আবির্ভূত হয়ে এল। সাঁওতালেরা জানে মাঝে মাঝে তার ওপরে ঠাকুরদেবতার ভর হয়।

চলে যা, চলে যা তুই! দেবতার নাম করে বলছি তুই চলে যা। শাড়ি, চুড়ি, তেল—যা চাস সব পাবি।

ভয়ে বিস্ময়ে সর্দারের চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বিস্ফারিত হয়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম করছে। দেবতার নামে যা বলবে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে সব। দেবতার একটি কুদৃষ্টিতে ঝাঁকে ঝাঁকে জ্যান্ত মানুষ মরে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে—গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে পারে। ভীত চঞ্চল সাঁওতালেরা চারপাশে এসে ভিড় করে দাঁড়াল, এই সুযোগে নিজেদের ভাগ্যটাকে একবার যাচাই করে নিলে হয়।

—শহর!—শাড়ি—চুড়ি—তেল? একটা অদ্ভুত স্বপ্নলোক। বুধনীর চিন্তা আকস্মিকভাবে যেন খেই হারিয়ে ফেলেছে।

সুন্দরলালের ওপর এখন পুরোপুরি ঠাকুরের আবির্ভাব। বুড়ো জেঠা টুডুকে সে বাতলে দিচ্ছে হাঁপানির ওষুধ। দিগ্ দিগন্ত উদ্ভাসিত করে নির্মম চাঁদের আলো অসীম প্রীতি আর বিশ্বাসের মতো ঝরে পড়ছে—ছড়িয়ে যাচ্ছে যেন রজনীগন্ধার অসংখ্য ছিন্ন পাপড়ি। মহুয়ার গন্ধে শালফুলের বিষাক্ত বিশ্বাস চাপা পড়ে গেল। শুধু অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে ভুটানী খচ্চরটা। কী একটা অস্বস্তি অনুভব করে খট খট করে শব্দে সে মাটির ওপর পা ঠুকতে লাগল।

খুব জোরে ওঠা সুন্দরলালের অভ্যাস।

সূর্য সামনের পাহাড়টাকে ভালো করে রাঙিয়ে তোলার আগেই সে ঘরের বাইরের দড়ির খাটিয়ায় এসে বসে। তারপর হয়তো সুর করে তুলসীদাস পড়া সুর হয় তার :

‘ঘটহ রঢ়হ বিরহিনী দুখদাই
গ্রসহ রাহু নিজ সন্ধিহি পাই,
কোকশোকপ্রদ পঙ্কজদ্রোহী
অবগুণ বহুত চন্দ্রমা তোহি—’

কিন্তু সীতার বিরহ নিয়ে বেশিক্ষণ সময় কাটাবার জো নেই। সাঁওতাল তাকে গুরু বলে মানতে শুরু করেছে আজকাল, সবকিছু কাজেই তার পরামর্শ ছাড়া এখন আর চলে না।

পাহাড় থেকে হরিণের পাল নেমে গম খেয়ে যাচ্ছে, তার কী প্রতিকার? বড়কা সাঁওতাল কী এক সাঁওতাল মেয়ের কপালে সিঁদুর লেপে দিয়েছে, অথচ সমাজের আইনে তাদের বিয়ে হতে পারে না, এর কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে? অমুকের পায়ের ঘা আজ তিন মাস ধরে সারছে না, কেউ কি তার কোনো অনিষ্ট করল?

এমন অনেক প্রশ্নের মীমাংসাই করতে হয় সুন্দরলালকে। কিন্তু নাঙ্গা বাবার আশীর্বাদের জোর আছে তার ওপরে। পশুপতিনাথের মন্দির থেকে লাভ করা সিদ্ধি—সহজ কথা নয়। তিরিশ বছর বয়স পেরোনোর আগেই প্রাক্তন পুণ্যের বলে ইহলোক পরলোকের সড়ক পাকা করে নিয়েছে সে।

আজও সকালে তিলক সাঁওতাল এসে দেখা দিলে।

—তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে বাবাঠাকুর।

প্রকাণ্ড একটা ভাঙের গুলি মুখে পুরে দিয়ে সুন্দরলালের মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। 'রামরচিত মানস' এক পাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে প্রশ্ন করলেন—'কী কথা?'

তিলক সাঁওতাল গলার আওয়াজ নিচু করে আনল : তুমি বাণ মারতে জানো?

—বাণ?—একটা বিচিত্র হাসিতে সুন্দরলালের চোখমুখ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল : আমি বাণ মারতে জানিনে? আমি জানিনে তো কে জানে, শুনি?

তিলক সাঁওতাল অপ্রতিভ হয়ে বললেন—তাই বলছিলুম।

—তাই বলছিলি? তাই আবার কী বলবি? সেবার আসামের চা বাগানের এক সায়েবকে মেরে দিলুম না? তিনটা দিনও পেরোল না, মুখে রক্ত উঠে একেবারে—হুঁ হুঁ।

—কাবার হয়ে গেল?

—বিলকুল! খালি বাণ? ইচ্ছে হলে পিশাচ চালান করতে পারি।

তিলক রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বাণ মারা—কী ভয়ানক! তুমি জানোও না—মাটিতে রেখা দিয়ে তোমার মূর্তি আঁকা হয়ে গেল, আর সেই মূর্তির বুকে মেরে দেওয়া হলো মন্ত্রঃপুত তীর; নিশ্চিন্ত মনে সারা দিন ক্ষেত্রে কাজ করে সন্ধ্যেবেলায় তুমি বাড়ি ফিরেছ, হঠাৎ অসহ্য ব্যথা উঠল তোমার বুকে! তারপর কাশির সঙ্গে সঙ্গে তোমার ফুসফুস ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল—সাতটা দিনের ভেতরেই তুমি পুরোপুরি নিকাশ হয়ে গেলে। আর পিশাচ! যে পিশাচসিদ্ধ তার অসাধ্য কী আছে? এই সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ে পাহাড়ে কত অশরীরী প্রেতাত্মা ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায় কে বলতে পারে? সন্ধ্যার কালো আবরণের তলায় যখন শালের বনগুলো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, তখন তাদের বড় বড় খসখসে পাতার মর্মরে সেই প্রেতাত্মারা নিশ্বাস ফেলে যায়। সে নিশ্বাস যার গায়ে

লাগে, গোড়াকাটা লতার মতো শুকোতে শুকোতে একদিন শেষ আয়ুর বিন্দুটি অবধি তার মিলিয়ে যায় বাষ্প হয়ে। যেদিন রাত্রে পাহাড়ের মাথায় মাথায় ঝড় উঠে, মহুয়া গাছগুলো উপড়ে পড়ে, রাতচরা হরিণগুলো অবধি প্রাণের ভয়ে গমের ক্ষেতে নেমে আসে না—সে রাত্রিতে তারা উৎসব করে। সে-সময় যদি কেউ একবার ভুল করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তা হলে পরের দিন তার হাড় মাংসের একটি টুকরোও কোথাও খুঁজে যাওয়া যায় না। এই সমস্ত প্রেতাত্মা—এই সমস্ত ভয়ঙ্কর পিশাচেরা সব সুন্দরলালের হাতধরা।

—কাকে মারতে হবে?

তিলক চমকে উঠল। সুন্দরলাল হাসছে। হাসিটা মনোরম নয়—কী একটা অজ্ঞাত কারণে সমস্ত মনটাকে সংকুচিত, সন্ত্রস্ত করে আনে।

ব্যগ্র কণ্ঠে তিলক বললে : ও গাঁয়ের ডোমন মাঝিকে। কিছুদিন থেকেই আমার পিছে লেগেছে। বললে বিশ্বাস করবেন না বাবাঠাকুর ওর তুকমন্তরের চোটেই গত মাসে আমার ছেলেটা মরে গেল। তাগড়া জোয়ান ছেলেটা—দেখতে দেখতে ছটফটিয়ে মরে গেল।

তিলকের চোখের কোণ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

—হুঁ! গম্ভীর হয়ে গেল সুন্দরলাল : তোর কাজটা করে দেব আমি—পিশাচ চালান দিয়ে দেব। পরশু শনিবার, কয়েকটা ফুল আর সিঁদুর নিয়ে আসবি, আমি তিনটে নরমু—জোগাড় করে রাখবো। তাই দিয়ে পিশাচ পুজো করতে হবে। তা হলে কী হবে জানিস?

তিলক ঘাড় নাড়ল।

—তা হলে রোজ রাত্তিরে সব যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন প্রকাণ্ড একটা কালো পিশাচ এসে চেপে বসবে তার গায়ের ওপর। তারপর সেই পিশাচটা তার মুখখানাকে নলের মতো ছুঁচালো করে দিয়ে তার মাথার ভেতর থেকে চোঁ চোঁ করে রক্ত আর ঘীলু শুষে খাবে। তারপর—

কথাটা অসমাপ্ত রেখে সুন্দরলাল হেসে ওঠে। তার বলার ভঙ্গিতে এই সকালের আলোতেও তিলকের মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে আতঙ্কে। দৃশ্যটা সে মনের সামনে কল্পনা করতে লাগল।

—যা মাঝি, পরশু আসিস। ফুল আর সিঁদুর যেন মনে থাকে। আর একটা কথা, এর পর পরে কিন্তু ক-দিন তোকে গাঁয়ের বাইরে আর কোথাও গিয়ে থাকতে হবে। ডোমনের রক্ত খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পিশাচটা আশেপাশে খুঁজে বেড়াবে তোকে। পেলে কিন্তু আর রক্ষা রাখবে না।

আর একবার তিলকের আপাদমস্তক নিদারুণ বিভীষিকায় চমক উঠল।

তিলক চলে যাওয়ার পর সুন্দরলাল অনেকক্ষণ বসে রইল নীরবে। সামনে 'রামচরিত মানসে'র খোলা পাতাগুলো ফর ফর করে উড়ে যাচ্ছে। উড়ন্ত একরাশ

কালো কালো পলাতক হরফের মাঝখানে গন্ধমাদনধারী হনুমানের একখানা বীরমূর্তি পলকের জন্য উঁকি মেরে গেল—রূঢ় খানিকটা রঙের প্রলেপ। দূরে মাঠের ওপর চলছে একদল মহিষ, দুটির গলায় বাঁশের বড় বড় চোঙা বাঁধা। আর সবকিছুর ওপর দিয়েই সকালের রোদ প্রসন্ন একটা দীপ্তিমণ্ডলের মতো উদ্ভাসিত।

তত্ত্বচিন্তায় বিভোর হয়ে উঠেছে সুন্দরলালের মন। এমন করে আর চলে না। দু-মাস—মাত্র দু-মাস সময়, অথচ এমন একটু একটু করে এগোতে গেলে গোটা বছরই যে কাবার হয়ে যাবে। ওদিক 'সীজন টাইম' পেরিয়ে গেলে এসবের কোনোটারই কোনো অর্থ হয় না।

চেনা হাসির আকস্মিক একটা বন্যা শুধু কান নয়—সমস্ত মনের ওপরই যেন ভেঙে আছড়ে পড়ল। নদীর ঢেউয়ের মতো উচ্ছলিত চটুলতায় রাঙা কাঁকরের পথ বেয়ে একদল মেয়ে এগিয়ে আসছে। দিকে দিকে বসন্তের বিহ্বল মদিরতা, আর তার মাঝখানে এরা যেন পরিপূর্ণ পানপাত্র। হাতের ছোট ছোট ঝাঁপিগুলো ভরে মহুয়া কুড়িয়ে নিয়েছে, আর খোঁপায় জড়িয়েছে পত্রপল্লবে সমৃদ্ধ একগুচ্ছ নাগকেশরের ফুল।

সুন্দরলালকে দেখেই থমকে দাঁড়াল মেয়েরা। নিজেদের ভেতরে কিছুক্ষণ কী সতর্ক আলোচনা চলল তাদের। সুন্দরলালকে তারা ভয় করে, কিন্তু তার চারদিক দিয়ে অতীন্দ্রিয় রহস্যের যে ঘন একটা কুয়াশা ঘেরা, তাদের কৌতূহলী মন মাঝে মাঝে সেই কুয়াশার ভেতর প্রচ্ছন্ন জগৎটাকে আবিষ্কার করতে চায়।

বুধনী ইতস্তত করছে, কিছু যেন একটা বলার আছে তার। অত্যন্ত বিপন্ন মুখে আঙুল দিয়ে গলার রুপোর হাঁসুলিটা খুঁটতে লাগল সে। একটি মেয়ে আলগাভাবে তাকে ধাক্কা দিলে—যেন তাঁদের সকলের কাছেই বুধনী কী একটা কৌতুক এবং কৌতুকের বস্তু হয়ে উঠেছে।

সুন্দরলালের চোখেমুখে অতি প্রকট তীক্ষ্ণতা :

—কি রে বুধনী?

কিন্তু বুধনীকে কিছু আর বলতে হলো না। বাঁধ ভেঙে উচ্ছ্বসিত কলতরঙ্গে যেন বেরিয়ে এল জোয়ারের জল। হাসির দোলায় মেয়েদের পরিপূর্ণ অপরূপ তনুসৌষ্ঠব ছন্দোময় হয়ে উঠল—সুন্দরলালের মনে হলো : কামানায় যেন শাণিত খানিকটা কালে, আঙুন দেহে-প্রদীপগুলোতে উঠল শিখায়িত হয়ে।

—এত হাসছিল যে—সুন্দরলালের চোখ দুটো নির্লজ্জভাবেই ঘুরতে লাগল বুধনীর সর্বাঙ্গকে বিশ্লেষণ করে! এ দৃষ্টি হয়তো শরীরের কেবল বাইরেটারে দেখছে না, হয়তো তীক্ষ্ণ একটা সন্ধানী আলো ফেলে বুধনীর মনটাকেও দেখে ফিরছে। এক যোগীর দৃষ্টি—ভোগীর নয়।

বুধনীর সাহসের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সুন্দরলালের দ্বিতীয় প্রশ্নে তাও যেন মিলিয়ে গেল নিঃশেষ হয়ে। মেয়েদের হাসি দ্বিগুণ হয়ে উঠল। পরক্ষণেই রূপের

প্রখর বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দিতে তারা পথের ওপরে দিয়ে এক ঝলক দখিনা বাতাসের মতো বয়ে গেল। সুন্দরলাল হাঁ করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। দু'মাস মাত্র সময়—কিন্তু দুটি দিন মাত্র বেশি দেরি হয়ে গেলে সত্যই কী আর ক্ষতি হবে! বাগানে অনেক মেয়ে আছে, কিন্তু বুধনীর জুড়ী নেই। সুন্দরলালের দুটো চোখে যেন গোখরো সাপ উঁকি মারতে লাগল। সায়েব ভালো জিনিসের কদর বোঝে, দুদিন বিলম্ব তার কাছে কিছুই নয়।

আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সুন্দরলাল যে অনেকটা এগিয়ে গেছে তাতে আর সন্দেহ কি?

সন্ন্যাসী মানুষ, ঘর ছেড়ে সেই কবে বেরিয়ে পড়েছে। বিষয়বাসনতার কোনো প্রলোভনই নেই—সংসারে পরের উপকার ছাড়া আর কিছুই সে জানে না। ঝাড়ু সাঁওতাল এ কথা বিশ্বাস করে, বুধনীর সন্দেহমাত্র নেই, সুন্দরলালের মুখের দিকে তাকাতেও পা কেঁপে ওঠে তিলকের।

কিন্তু পশুপতিনাথের মন্দিরে পাওয়া সেই সিদ্ধমন্ত্র। তার বলে কি না সম্ভব হয়! সুন্দরলাল টাকা তৈরি করতে পারে নিশ্চয়ই। কারো দরকার পড়লে অযাচিতভাবেই সে কাঁচা কড়কড়ে টাকা বের করে দেয়, নতুন টাকা—ঝকঝকে টাকা। হয়তো অনেকটা এই কারণেই সাঁওতালেরা এত বেশি তার কাছে মাথা বিকিয়ে বসে আছে। ইচ্ছে করলে সে নাকি নুড়ি পাথরগুলোকে অবধি তাল তাল সোনা বানিয়ে দিতে পারে। জিজ্ঞেস করলে কোনো জবাব দেয় না—রহস্যময়ভাবে হাসে।

আরো অনেকদিন পরে।

বিনি সাঁওতালনীর কী একটা মানসিক। শালবনের মাঝখানে সিঁদুর মাখানো ওই যে বড়ো কালো পাথরটা—ওখানে শিং-বোঙার পূজো। উপচার মুরগি আর মহুয়ার মদ।

খচ্চরে চড়ে সুন্দরলাল এসে উপস্থিত হলো।

তখন বলি শেষ হয়ে গেছে। পাথরটার চারপাশে ছিন্নকণ্ঠে মুরগির রক্ত। শাল-ফুলের গন্ধে বাতাস কেমন ভারী—যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হয়।

মাদল বাজছে—তার সঙ্গে চলছে নাচ। কিন্তু জ্যোৎস্না রাতের মহুয়া মদির অসংযত নাচের দোলা এ নয়। সে নাচে রক্তে রক্তে একটা তরল নেশা ঘনিয়ে আসে, আর এ নাচে যেন মনের ওপর একটা অস্বস্তির আমেজ দেয়। পাহাড়ের কোলজুড়ে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে নিবিড়-নিবদ্ধ শালের বন—বড় বড় পাতা স্তরে স্তরে সূর্যকে আড়াল করে সৃষ্টি করেছে প্রায়ন্ধকাল একটা নিভৃতলোক। এই নিভৃতলোকের মাঝখানে অশরীরী শিং-বোঙা যে কোনো মুহূর্তেই হয়তো দলবল নিয়ে শরীরী হয়ে উঠতে পারে।

সুন্দরলাল আসতেই মদের পাত্র এল এগিয়ে, মহুয়ার সুরায় আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করে নিলে সুন্দরলাল। শিং-বোঙার কালো পাথরটার গায়ে রক্ত আর সিঁদুর

লেপা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় পাথরটা যেন কারো একখানা প্রসারিত মুখ—সত্যি সত্যিই যেন রক্ত খেয়েছে, যেন আরো রক্ত খাওয়ার জন্য তাকিয়ে আছে তৃষ্ণার্ত চোখে।

সুন্দরলাল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল। একবার স্থির মত্ত চোখ মেলে তাকাল সকলের দিকে। তারপর টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে সোজা পাথরটার সম্মুখে আছড়ে পড়ল। পায়ে লোহার নালতোলা কাঁচা চামড়ার জুতো আর কুর্তার পকেটের টাকাগুলোয় মিলে উঠল একটা চকিত যুগ্মধ্বনি।

কয়েক মুহূর্ত পরেই উঠে দাঁড়াল সে। জামায় খানিকটা ধুলোর দাগ। একটু আগেই পান খেয়েছিল, মুখের দু'পাশে খানিকটা লাল রঙের গ্যাঁজলা বেরিয়ে রয়েছে বীভৎসভাবে। সকলের ওপর দিয়ে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ সে তাণ্ডব তালে নাচতে শুরু করে দিল।

সোৎসাহে মাদল বেজে উঠল—ডুম ডুম করে উল্লাস জানাল নাকারা-টিকারা। সুন্দলালের ওপর ভর হয়েছে—শিং বোঙার ভর। সাঁওতালদের চেতনার ওপর ছড়িয়ে পড়ল ভয় আর আনন্দের একটা বিমিশ্র অনুভূতি।

হেলেদুলে সুন্দরলাল নাচতে লাগল। মুরগির খানিকটা রক্ত সে হাতে মুখে মেখে নিয়েছে, এই মুহূর্তে তাকে পৈশাচিক বলে মনে হতে পারে। পায়ের কাঁচা চামড়ার জুতোটা দূরে ছিটকে পড়েছে—পকেটের টাকাগুলো সমান তালে বাজছে ঝন ঝন করে।

আকস্মিকভাবে সুন্দরলাল থেমে দাঁড়াল।

অপ্রকৃতিস্থ চোখ দুটো যেন রক্তে ভিজিয়ে আনা। তার কণ্ঠে সেই দৈববাণীর সুর :

—ঝড়ু সাঁওতাল, শুনছিস? আমি শিং-বোঙা, তোদের ডাকছি— শুনছিস?

আরো জোরে জোরো টিকারা বাজতে লাগল, আকাশ চিরে উঠল মাদলের শব্দে। সাঁওতালরা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল। ঝড়ু সাঁওতাল কাঁপা গলায় বললেন—কী হুকুম বাবা?

—আমার কথা শোন। তোদের গাঁয়ে মড়ক লাগবে, 'হায়জা'র মড়ক!—একটি প্রাণীও বাঁচবে না, মরে সব শেষ হয়ে যাবে। 'করম' দেবতার রাগ পড়েছে, তোদের কাউকে রাখবে না, কাউকেই নয়।

চমকে মাদলের শব্দে থেমে গেল—হাত থেকে নাকারা-টিকারা খসে পড়ল। শাল ফুলের গন্ধে বাতাসের গতি যেন স্তব্ধ হয়ে এসেছে!

সাঁওতালেরা হাহাকার করে উঠল। মেয়েদের মুখ থেকে বেরিয়ে এল ভয়াতুর আর্তনাদ। একসঙ্গে কলরব উঠল : কী উপায় হবে আমাদের বাবা ঠাকুর?

সুন্দরলালের কণ্ঠে দৈববাণীর সুর আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ঝড় উঠার আগে থমথমে কালো মেঘে আবৃত-ঈশান-দিগন্তের মতো তার মুখ :

—উপায় আছে। নাঙা বাবার শিষ্য এই সাধু সুন্দরলালকে আঁকড়ে ধর। ও তোদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, ওর সঙ্গে তোরা উত্তরে চলে যা। সেখানে ঘর পাবি, জমি পাবি, এর চেয়ে অনেক সুখে থাকবি।

আপত্তির ক্ষীণ প্রতিবাদ তুলে ঝড়ু মোড়ল বললেন—কিন্তু বাবা, ঘর বাড়ির সব ফেলে—

ঘর বাড়ি, ঘর বাড়ি!—বিকৃত ভ্রুকুটিতে সুন্দরলারের রক্তমাখা কুটিল মুখখানা প্রেতের মতো দেখাতে লাগল : ঘরবাড়ি আঁকড়ে থেকে সব মরবি তা হলে। করম বাবা তোদের কাউকে আস্ত রাখবে ভেবেছিস! হাড়-মাংস চিবিয়ে খাবে—মনে রাখিস। কুকুর-বেড়ালের মতো মরবি সব।

সুন্দরলালের চোখ দুটো রক্তে ভিজিয়ে আনা। সেই দুটো চোখের ভেতর সাঁওতালেরা যেন ভাবী মহামারীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল।

বনবাস ছেড়ে আবার সংসারের দিকে ফিরতেই হলো সুন্দরলালকে। উপায় নেই। 'করম' দেবতার কোপ থেকে এই নিরীহ সাঁওতালদের তার রক্ষা করতেই হবে। আর বিপন্নকে উদ্ধার না করলে তার কিসের সন্ন্যাস!

সকালের আলোয় সাঁওতাল পরগনার বনশ্রী অপরূপ হয়ে উঠেছে। পাহাড়ে পাহাড়ে বসন্ত যেন আনন্দের উল্লাসে তরঙ্গিত। ছোট ছোট গোলাপজামের মতো শাদা মহুয়ার ফুল তিক্তমধুর রসে পরিপূর্ণ হয়ে টুপটুপ করে খসে পড়ছে। ডালে ডালে সবুজের ছিট দেওয়া হারিয়ালে নাচ—ঘুঘুর একটানা করুণ ডাক।

গলার সামনে গাঁটরি বাঁধা সুন্দরলালের ভুটিয়া খচ্চরটা টুকটুক শব্দে ক্ষুদে ক্ষুদে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। পেছনে মাদল বাজছে—একটা অস্ফুট গানের গুঞ্জন। সাঁওতাল পুরুষেরা ঘর ছাড়ার দুঃখ ভোলবার জন্যই কেউ হয়তো বাঁশিতে সুর দিয়েছে। মেয়েদের মুখে কোনো ক্ষোভের ইঙ্গিত নেই। পথচলার আনন্দে তারা লীলায়িত, মাদলের ধ্বনির সঙ্গে তাদের কালো চুলে সাদা ফুলের মঞ্জরীগুলো দুলে উঠছে। বুধনীর চোখে স্বপ্ন। শহর, চুড়ি, তেল আর শাড়ি!

দেবতার হুকুম পেয়েছে সে...

...আসামর চা-বাগানে কুলি যোগানো কী যে অসম্ভব ব্যাপার, সেটা সাহেব জানে। কালাজ্বরে দলে দলে মরছে, আশপাশ থেকে একটি কুলি আনারও জো নেই। বুধনীকে বাদ দিয়ে—আড়কাঠি সুন্দরলাল হিসেব করতে লাগল : বুধনীকে বাধ দিলে, বেয়াল্লিশ জন কুলিতে তার কমিশন পাওয়া হয় কত!

সাঁওতাল পরগনার বিমুক্ত প্রকৃতিকে পরিপ্লাবিত করে দিয়েছে বসন্তের অকৃপণ আনন্দধারা। সকালের হাওয়া লেগে পাহাড়ি পথের ওপর কৃষ্ণচূড়ার একরাশ রাঙা পাপড়ি ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ল।